হেয়ারস্টাইলিং খুব সহজ কাজ নয়, রীতিমতো বিজ্ঞান রয়েছে এতে

লড়াই করে পরিচিতি তৈরি করেছেন, অনেক মেয়েকে করে তুলেছেন স্বনির্ভর। সেলেব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট এবং অন্ত্রপ্রনর **জলি চন্দর** পথচলার গল্প শুনলেন **সংবেত্তা চক্রবর্তী**।

তাঁর হাতের জাদুতে তৈরি হয় তারকা থেকে সাধারণ মানুষ, সকলের রূপ-কথা! সেলেব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট জলি চন্দ নিজে কিন্তু কম বয়সে রূপচর্চা-পার্লারের ধারপাশও মাড়াননি! ‘‘আমি ছিলাম, যাকে বলে টম বয়। মোটরবাইক চালাতাম, খেলাধুলো করতাম। ছেলেদের সালঁতে গিয়ে চুল কেটে আসতাম। আমদাবাদে বাড়ি ছিল আমাদের। গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরি করতে করতে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল! চলে এলাম কলকাতায়। মোটে ২২ বছর বয়স তখন আমার। খুব একা-একা লাগত বলে চাকরি করতে চেয়েছিলাম। শ্বশুরমশাই বোঝালেন যে রোজ যাতায়াত করতে আমার অসুবিধে হবে, বাড়িতেই যেন বুটিক জাতীয় কিছু করি। কিন্তু আমি তো স্রেফ দোকান খুলে বসে থাকার মানুষ নই, আমার কাজ করার খিদে প্রচুর! একদিন শাশুড়িকে নিয়ে পার্লারে গিয়েছি ফেশিয়াল করাতে। তখন আমি জানিই না ফেশিয়াল কী জিনিস! গিয়ে শুনলাম, একঘণ্টা লাগবে! ওই সময়টায় আমি বসে বসে দেখছি, আইব্রো করছে ট্যারাব্যাঁকা। চুল ইউ কাট করছে, ইউ-এর শেপটাই আসছে না! কেউ দেখার নেই, ক্লায়েন্টও কিছু বলছেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওই এলাকায় ওই পার্লারেরই একচেটিয়া ব্যবসা! মনে হল, এর চেয়ে ভাল কাজ যে হতে পারে, সেটা এদের বা ক্লায়েন্টকে দেখানোরই কোনও লোক নেই!’’ জলি প্রথমে ওই পার্লারেই বিউটিশিয়ান কোর্সে ভর্তি হলেন। পার্লারে কী হয়-না হয়, বুঝলেন। কিন্তু ওখানে তো তাঁর শেখার কিছু নেই! চলে গেলেন দিল্লিতে, শেহনাজ হুসেনের কোর্সে ভর্তি হতে! ‘‘বাড়ির লোকেরা তো অবাক, ভাবছে এ কী হচ্ছে! কিন্তু ট্রেনে উঠে আমার ভয় করছে যে কেউ যদি আমায় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে! জেগে জেগে ট্র্যাভেল করলাম। নেমে প্রথমে ট্যাক্সি করে অ্যাকাডেমিতে, সেখান থেকে অটো করে লেডিজ় হস্টেলে গিয়ে বললাম, থাকার জায়গা চাই। তারাও অবাক, আমি একা কলকাতা থেকে চলে এসেছি শুনে! তারপর ম্যানেজার নিজেই একটা জায়গা খুঁজে বের করলেন, যেখানে এক পঞ্জাবি মহিলা নিজের গ্যারেজে একটা বেড রাখতেন, স্টুডেন্টরা থেকে পড়াশোনা-কোর্স করবে বলে। স্রেফ একটা খাট আর পাখা, কোনও বাথরুম নেই! রাতে বাথরুম যেতে লাগলে মহিলার দরজায় টোকা দিয়ে, তাঁর ঘরের বাথরুমে যেতে হত!’’

কোর্স করে কলকাতায় ফিরলেন তিনি। ‘‘আমার বর বিয়ের আগে একটা ঘরে থাকতেন, পরে সেটা স্টোররুম হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ছিল একটা ড্রেসিং টেবিল। বাগড়ি মার্কেট থেকে একটা লাল চেয়ার আনলাম। আর রাখলাম একটা সোফা। নাম ঠিক করে, ছোট্ট একটা বোর্ড লাগিয়ে, অপেক্ষা করতে লাগলাম ক্লায়েন্টের। দিনের পর দিন কেউ আসে না। শেষে একজন মারোয়াড়ি মহিলা এলেন, আইব্রো করতে। কিন্তু পার্লারের অবস্থা দেখে, একটা আইব্রো করেই পালিয়ে গেলেন,’’ বলতে বলতে হেসে

ফেললেন জলি। ‘‘এইসব ধাক্কা খেতে খেতেই আমার যা কিছু শেখা। বুঝলাম, অ্যাম্বিয়্যান্স ভাল না হলে কেউ আসবে না। এদিকে টাকাপয়সাও বিশেষ ছিল না হাতে। আমি আর আমার বর ঠিক করলাম বিয়েতে যা টাকা উপহার পেয়েছি, তা দিয়ে ওই ঘরের অন্দরসাজ করাব। মানে সানমাইকা, কয়েকটা ড্রয়ার, চেয়ার, দেওয়ালে আয়না। একটি মেয়েকে নিলাম সাহায্যকারী হিসেবে। ম্যানিকিওর-পেডিকিওর ও করত। আইব্রো, ফেশিয়াল, হেয়ারকাট, সব আমি করতাম। কাজ করতে করতে লোকের মুখে মুখেই পরিচিতি ছড়াতে লাগল। কেব্‌ল টিভিতে সিনেমা দেখাত তখন, তার নীচ দিয়ে বিজ্ঞাপন যেত। সেখানে আমার পার্লারের অ্যাড দিলাম টাকা জমিয়ে। পাগলের মতো খাটতাম। যাকে পেতাম, চুল কেটে প্র্যাকটিস করতাম। ধীরে ধীরে পার্লার বাড়তে লাগল। মানুষ আমার হাতে চুল কাটতে ভালবাসেন বলে হেয়ারকাটিংয়ের চাহিদা বাড়তে শুরু করল। তারপর থেকে পার্লারের মেয়েদের স্কিনের কাজের দায়িত্ব দিয়ে, নিজে শুধু হেয়ারকাটিংই করতে শুরু করলাম। এখন শুধু স্কিন কনসাল্টেশন করি,’’ বয়ান তাঁর। বাড়ির লোকেরা পাশে ছিলেন? ‘‘পাশে ছিলেন, তবে সকলেরই আমার কাজটা নিয়ে একটু অসুবিধে ছিল। তখন তো ‘হেয়ারস্টাইলিস্ট’ কথাটা তেমন কেউ জানত না! আমি হেয়ারকাটিং করি— এই কথাটা লোককে বলতে হয়তো অসুবিধে হত, যেটা আমি এমনি চাকরি-বাকরি করলে হত না! এমনিও দেখেছি, বাঙালিরা এই পেশাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো সম্মান দেন না। আমি চাই, এটা বদলাক। বাঙালি নতুন প্রজন্ম আরও বেশি করে এই পেশায় আসুন। খুব সহজ কাজও এটা নয়, রীতিমতো বিজ্ঞান রয়েছে এতে।’’

তৃণা ও নীলের সঙ্গে

ক্লায়েন্ট যখন প্রসেনজিৎ

তাঁর পার্লারের অনেক মেয়েই ডিস্টার্বড ফ্যামিলির। কেউ ফল বিক্রি করতেন, কেউ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে যোগা করাতেন... এঁদের সকলকে কাজ শিখিয়েছেন জলি। বললেন, ‘‘মেয়েরা স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেটা যেন না হারায়। আর শুধু স্বপ্নই না দেখে, তাকে সফল করার জন্য যেন কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। জেদ থাকলে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই।’’

অভিনয়ও করেছেন জলি। নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ‘মনসুর মিঞার ঘোড়া’ ছবিতে, তা ছাড়া ‘দুসরি কহানি’ টেলিছবিতে। বললেন, ‘‘দেখলাম, অনেক সময় চলে যাচ্ছে, পার্লারে মন দিতে পারছি না। তারপর সব ছেড়ে পার্লারেই মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি। একাধিক আন্তর্জাতিক অ্যাডভান্সড কোর্স করেছি। অনেক পুরস্কার, সম্মান পেয়েছি। শেখার তো শেষ নেই, মানুষের এই ভালবাসারও যেন শেষ না হয়!’’

বাঙালিরা এই পেশাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো সম্মান দেন না। আমি চাই, এটা বদলাক।

প্রথম পাতার ছবি সৌজন্যে: জলি চন্দ
বাকি ছবি সৌজন্যে: সোশ্যাল মিডিয়া